এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০৪

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গেলো। ভোরে ওঠার কোন পরিকল্পনাই আমার ছিলো না। অথচ উঠতে হলো। কিছুটা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেখি দাড়িওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ভীষণ চমকে উঠলো। বুঝতে পারছি আর কাউকে আশা করছিলো সে। এত ভোর বেলায় সে আমার দরজা ধাক্কালো কেন এরকম একটা প্রশ্ন করার জন্য মুখের ভেতর শব্দ তৈরি হচ্ছিলো আমার। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে ‘‘সরি সরি’’ বলে সামনের রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার রুমের সামনের রুম হলো ১০৫২। একটা মেয়ে উঠেছে সেখানে। কাল রাতে মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছে আমার। দাড়িওয়ালা ছেলেটাকেও দেখেছি আমি কন্‌ফারেনসে। তার রুম করিডোরের শেষ প্রান্তের কোন একটা হবে, ১০৪৮ বা ১০৪৯। বেচারা ঘুম ঘুম চোখে ১০৩২কে ১০৫২ মনে করেছে।

জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম। পূর্বদিকটা লাল হতে শুরু করেছে। এখানে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। এতটা ওপরে পাখিরা সম্ভবত উঠতে পারে না বা উঠতে চায়না। ভোরের এডেলেইড দেখতে কেমন লাগে দেখার শখ হলো খুব। ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলো দাড়িওয়ালার সাথে। সাথে মেয়েটিও আছে। জগিং করতে বেরিয়েছে। দাড়িওয়ালা আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। ছেলেটার চোখের দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। সামান্য কয়েক সেকেন্ডের দেখা হয়েছে সকালে। তারপরও সে চিনতে ভুল করছে না, তাহলে ১০৩২কে ১০৫২ ভাবার কারণ কী? সে যাকগে। কাছে এসে আলাপ করলো সে। আবার ক্ষমা চাইলো সকালে এরকম পরিস্থিতির জন্য। আমি বললাম,

- ইট্‌স ওকে ম্যান।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। ছেলেটার নাম প্রহ্‌লাদ। তার চেহারা বা গায়ের রং কোনটাই তার নামের সাথে মেলে না। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে জানা গেলো তাদের আদিবাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারতীয় নামটা পেয়েছে তার মায়ের বাবার কাছ থেকে, আর গায়ের রং চেহারা সবকিছু পেয়েছে বাপের দিক থেকে। মেয়েটার নাম অ্যানেট। দু’জনই গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। তাদের গবেষণার বিষয় কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স। তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে এডেলেইডকে দেখলাম ভোরের নরম আলোয়। এতো ভালো অনেক দিন লাগেনি। ইচ্ছে করছিলো জুতো খুলে খালি পায়ে হাঁটি ঘাসের ওপর। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ হলো না। কে কী মনে করবে জাতীয় অনাবশ্যক সংকোচ এখানেও। হাঁটতে হাঁটতে সোনালী আলোয় এই শহরের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রহ্‌লাদকে ধন্যবাদ দিলাম আমাকে

জাগিয়ে দেবার জন্য।

সকাল ন'টায় বনিথন হলে গিয়ে বসলাম। আজ দেখি কিছু স্ট্যান্ড ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও গরম কিছু আয়ত্তে আসবে বলে মনে হয়না। আজকের প্লেনারী সেশানের বক্তৃতা দু'টি মোটামুটি আকর্ষণীয়। প্রথমটির বক্তা ডক্টর অ্যালেন জোন্‌স। বৃটেনের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্সের চিফ এক্সিকিউটিভ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর জন্য বৃটেনে এখন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না শুনে চমকে উঠলাম। বৃটেনে বর্তমানে শতকরা ৬৬ ভাগ স্কুলে পদার্থবিজ্ঞানের জন্য কোন শিক্ষক নেই। সেসব স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান যারা পড়ান তাদের কোন পদার্থবিজ্ঞানের ডিগ্রী নেই। সেসব শিক্ষকদেরও শতকরা ৭০ ভাগের বয়স এখন চল্লিশের ওপরে। বৃটেন এখন চিন্তা করছে আগামী ২০ বছর পরে দেশের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার কী অবস্থা হবে। এখন থেকেই সরকারী ভাবে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়ে গেছে। আমি বাংলাদেশের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থাটা একটু চিন্তা করেই ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তা আমেরিকার ক্যানসাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডিন ঝল্‌ম্যান। মাথার কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুলগুলি বাদ দিলে পুরোটাই প্রফেসর শংকু। তিনি বললেন কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কীভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স শেখানো যায়। তাঁদের তৈরি প্রোগ্রাম মঞ্চে স্থাপিত কম্পিউটারের বিশাল পর্দায় দেখালেন তিনি। এ জাতীয় প্রোগ্রাম ডিজাইন করা এবং তার প্রয়োগ করা আমেরিকার মতো ধনী দেশগুলোর পক্ষেই সম্ভব। কারণ এই একটা প্রোগ্রামের খরচ আমাদের দেশে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সারাবছরের মোট বাজেটের চেয়ে বেশি। সকাল এগারোটা থেকে প্যারালাল সেশান শুরু আজ। আমি চলে গেলাম ফিজিক্স বিল্ডিং এ। সারাদিন কেটে গেলো নিউক্লিয়ার এন্ড পার্টিক্যাল ফিজিক্সের লেকচার শুনতে শুনতে।

রাত আটটায় পাবলিক লেকচার। বনিথন হলে। পল ডেভিসের লেকচার। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে লোকের ভীড় শুরু হয়ে গেলো। কনফারেনসের ডেলিগেট হিসেবে আমরা ফ্রি টিকেট পেয়েছি। সাধারণের জন্য প্রবেশ মূল্য বিশ ডলার। দশ বারো বছরের স্কুলস্টুডেন্ট থেকে শুরু করে হুইল চেয়ারে বসা আশি বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত এসেছেন পল ডেভিসের বক্তৃতা শুনতে। আটটার আগেই বারোশ সিটের বনিথন হল কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেলো। আমি মঞ্চের একদম কাছে বসেছি। আমার সারিতেই আশে পাশে বেশ কিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রী। ছাত্রীরা বেশ সেজে গুজে এসেছে, বেশ উচ্ছল দেখাচ্ছে তাদের। সে তুলনায় ছাত্ররা একটু নিষ্প্রভ। একজন একাডেমিকের বক্তৃতা শোনার জন্য লোকজন বিশ ডলারের টিকেট কেটে হলে ঢুকেছে যেখানে সিনেমার টিকেটের দাম মাত্র আট ডলার। আমাদের দেশে এখনো এরকম আশা করা যায় না। অস্ট্রেলিয়ানরা ক্রমে ক্রমে বিশ্বসভায় তাদের জায়গা করে নিচ্ছে। সারা পৃথিবীর প্রতি ৩০০ জন মানুষের মধ্যে মাত্র একজন অস্ট্রেলিয়ান। অথচ পৃথিবীর প্রতি ১০০টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে দুটি প্রবন্ধের লেখক অস্ট্রেলিয়ান। আর বাংলাদেশ? জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথিবীর প্রতি চল্লিশজন মানুষের মধ্যে একজন বাংলাদেশী। জ্ঞান বিজ্ঞানে আমাদের অবদান কেমন? আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গবেষণা

প্রবন্ধের সংখ্যা? প্রশ্ন না করাই ভালো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল নীল সাদা গোলাপী নানা রঙের শিক্ষকদের নানা রকম রাজনৈতিক বিবৃতি দিতেই তো সময় চলে যায়, গবেষণা করার সময় কোথায়?

ঠিক আটটায় মঞ্চে এলেন ডক্টর পল ডেভিস। পল ডেভিসকে আগে দেখেছি টেলিভিশনে। ভিডিওতে তাঁর ব্ল্যাকহোল বিষয়ক আলোচনা দেখেছি। আজ এতটা কাছ থেকে পল ডেভিসকে দেখে দারুণ ভালো লাগছে। দেখে মনেই হয়না তাঁর বয়স চুয়ান্ন। পৃথিবীবিখ্যাত লেখক, গবেষক, বক্তা এই পল ডেভিস। কসমোলজিতে প্রফেসর স্টিফেন হকিং এর মতোই জনপ্রিয়তা পল ডেভিসের। বৃটেন থেকে এসে এখন স্থায়ীভাবে বাস করছেন এডেলেইডে। অসংখ্য মেডেল পুরষ্কার সম্মানে ভর্তি তাঁর ক্যারিয়ার। ২০০১ সালের ক্যাভেন্ডিস পুরষ্কার তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য আজই চলে এসেছেন পুরষ্কার কমিটির চেয়ারম্যান নিজে, বৃটেন থেকে। ২০০১ সালের পুরষ্কার ২০০০ সালেই দিয়ে দিলেন পল ডেভিসের হাতে। পুরষ্কার দেয়ার সময় মজা করে বললেন,
- এটা এক ধরণের টাইম ট্রাভেল।
শুনে সবাই হেসে উঠলো। কারন পল ডেভিসের আজকের বক্তৃতার বিষয় ''টাইম ট্রাভেল, ফ্যাক্ট অর ফিক্‌শান?''

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নীরস খটমটে বিষয়ও যে কতটা প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায়, তা পল ডেভিসের বক্তৃতা শুনে আবারো বুঝলাম। এই লেকচার বোঝার জন্য ফিজিক্সের জটিল জটিল সূত্র জানার কোন দরকারই নেই। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মগুলো বুঝতে পারার মতো সাধারণ বোধ থাকলেই হলো। পুরো দুঘন্টা ধরে সম্মোহিত হয়ে বক্তৃতা শুনলো মানুষ। হলের ভেতরের গুমোট গরমেও মানুষ উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকলো। মাঝে মাঝে পল ডেভিসের রসিকতায় হল কাঁপিয়ে হাসছিলো, পরক্ষণেই প্রসঙ্গ বদলের সাথে সাথে চুপ করে যাচ্ছিলো। বিজ্ঞানে রস সৃষ্টি করার ক্ষমতা সবার থাকে না। যাঁদের থাকে তাঁরা অসাধারণ, তারা জনপ্রিয়। পল ডেভিস দু'টোই। বক্তৃতা শেষে দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রায় আধঘন্টা ধরে। এর পরে পড়লেন অটোগ্রাফ শিকারীদের খপ্পরে। হল থেকে বেরিয়ে এলাম অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে।